প্রগতি লেখক সংঘ : ইতিহাস, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার

তাপস চট্টোপাধ্যায়

১৯৩০ দশকটি বিশ্বইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে ফ্যাসিবাদের উত্থান,বর্বরোচিত তান্ডবলীলা ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উন্মত্ততার ঘটনাপ্রবাহে।শিশু সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে হত্যা করাও ছিল অন্যতম লক্ষ্য। জার্মানীতে নাৎসীবাদ এবং ফ্যাসিষ্ট হিটলারের নেতৃত্বে ইতালী, স্পেন, জাপান ও সহযোগী কিছু দেশে ইহুদি ও অন্যান্য জাতিগত নিধনের সাথে স্বাধীন চিন্চা ও বিবেক বুদ্ধিকে আক্রমণ, বিতারণ ও নির্বিচার হত্যাকান্ড চলতে থাকে। হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিন্তক,সাংবাদিক ও শান্তিবাদী কেউ রেহাই পান নি। আবার পাশাপাশি, দানবীয় ঔদ্ধত্য ও যুদ্ধবাদের এই দশকটি ছিল অত্যাচার ও আগ্রাসনে জর্জরিত সমাজবিকাশের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতিবাদ, সংঘর্ষ ও সৃষ্টির প্রখর ঔজ্বল্যে মুখর। অর্থনৈতিক সঙ্কটের রাজনৈতিক প্রভাব জার্মানিতে একনায়কতন্ত্রের দানবের জন্ম দিয়েছিল। হিটলার এবং তার নাৎসি পার্টির দ্বারা নির্বাসিত জার্মানির চারুকলা ও শিক্ষার উজ্জ্বল জগৎ এবং দমন পীড়ন ও নির্মম অত্যাচারে পালিয়ে আসা দুর্দশাগ্রস্থ শরণার্থীদের কাছ থেকে ফ্যাসিবাদী দমন-যন্ত্রণার অভূতপূর্ব নির্যাতনের কাহিনী বিশ্ববাসীর নজরে এল। একের পরে এক অষ্ট্রিয়া, আবিসিনিয়া, স্পেন, পোলান্ড, চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিষ্ট অক্ষশক্তির দ্বারা আক্রান্ত হল। এই বিপন্ন সময়ে, যুদ্ধ, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বর্বরতার বিরুদ্ধে, শিল্পী সাহিত্যিকের অবাধ মতপ্রকাশ এবং বিশ্বশান্তির দাবী বুকে নিয়ে ইউরোপে কলম ধরলেন ম্যাক্সিম গোর্কি, রঁমা রঁলা, আঁরি বারবুস, আঁন্দ্রে জিদ, আঁন্দ্রে মালরো, টমাস ম্যান, ওয়ালদো ফ্রান্ক, রালফ ফক্স, অলডাস হ্যাক্সলি, বার্টান্ড রাসেল প্রমুখ মনিষীগণ। তাঁদের সংগঠিত প্রচেষ্টায় ১৯৩৩ সালে গড়ে উঠল শান্তি-মানবতা ও সুস্থসংস্কৃতির দাবীতে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বকংগ্রেস। প্রথম বিশযুদ্ধের সময়ে স্পেনের গৃহযুদ্ধে আঁরি বারবুস, রালফ ফক্স এবং অন্য বুদ্ধিজীবীদের একহাতে মসি ও অন্য হাতে অসি নিয়ে আক্রান্ত মানবতার পক্ষে সংগ্রামের সুমহান ইতিহাস ও ঐতিহ্যবোধ এই সংঘবদ্ধতা গড়তে অনুপ্রেরণা দেয়।

আলোচ্য সময়ে, অবিভক্ত ভারতবর্ষের একদল ছাত্র আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ে ব্রিটেনে উচ্চতর পড়াশোনা ও গবেষণা করছিলেন। তাঁদের চিন্তা, মনন ও জীবনবোধের ভিতটা ছিল শিল্পবোধে ভাস্বর এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির শাখা প্রশাখায় সৃজনের প্রবল আগ্রহ, দক্ষতা এবং প্রতিভায় ঋদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের নিষ্ঠুর,শাসন, পেষণ ও শোষণ থেকে ভারতের জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির সংগ্রামে সাহিত্য, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির সৃজনকে

অস্ত্র ও শস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে তাঁরা ছোট ছোট সভা, আলোচনা, মতবিনিময়, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর বিতর্ক এবং সাহিত্যের পত্রপত্রিকায় কবিতা,গল্প,নাটক,প্রবন্ধ প্রকাশ করে জোটবদ্ধ হতে থাকেন। সামন্ত-অধ্যুষিত ভারতীয় সমাজের কুসংস্কার ও বন্ধ্যা মতাদর্শের বিরোধিতাও ছিল এই সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম উদ্যেশ্য। এঁরা বিশ্বাস করতেন, দলিত-অপমানিত-লান্ছিত মানুষকে স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও অঙ্গীকারবদ্ধ করে তুলতে এবং গরীব জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রভাগে সমবেত করতে সংস্কৃতি হতে পরে অন্যতম হাতিয়ার। উনিশ শতকের ইংল্যান্ডে 'প্রগতি' শব্দটির তাৎপর্যটিও নিহত ছিল এমনই বোধে। দেশে দেশে আক্রান্ত, নিপীড়িত ও গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বন্চিত জনগণের মুক্তির জন্য দায়বদ্ধতা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফলকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতা অর্জনের জন্য আপোষহীন কর্মতৎপরতায় শিল্পসংস্কৃতিও অন্যতম শানিত অস্ত্র, এই মতাদর্শ তখন বিশ্বের বুদ্ধিজীবি মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৫ সালে, সেন্ট্রাল লন্ডনের ডেনমার্ক স্ট্রিটে অবস্থিত " নানকিং রেস্তোঁরা"র একটি হলে গঠিত হয়েছিল "ভারতের প্রগতি লেখক সংঘ"।

হ্যারল্ড ল্যাস্কি, হার্বার্ট রীড, মন্টেগু শ্ল্যাটার, ই এম ফস্টার প্রমুখ বিগদ্ধ ব্রিটিশ সাহিত্যিকদের উৎসাহ এবং সহমর্মিতা নিয়ে যে সকল ভারতীয় লেখক এবং বুদ্ধিজীবীরা এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের নায়ক, তাঁরা হলেন মুলক রাজ আনন্দ, সাজ্জাদ জাহির, জোতির্ময় ঘোষ, আহমেদ আলি, রজনীপাম দত্ত প্রমুখ। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রে লেখা হল : " সমকালীন ভারতীয় সমাজে ঘটে চলেছে নানান মৌলিক পরিবর্তন ... আমরা মনে করি, ভারতের নতুন সাহিত্যকে অবশ্যই আমাদের অস্তিত্বের প্রাথমিক সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে হবে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য, সামাজিক পশ্চাৎপদতা এবং রাজনৈতিক পরাধীনতার সমস্যাগুলিকে সাহিত্যে স্থান দিতে হবে। যে জীবনবোধ আমাদের নিষ্ক্রিয়তা, উদাসীনতা, অকার্যকরতা এবং সমাজবিচ্ছিন্নতার দিকে টেনে নিয়ে যায় তাকে আমরা প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে প্রত্যাখ্যান করব। প্রগতিশীল সংস্কৃতিচর্চা বলতে বুঝব, আমাদের মধ্যে যা বিতর্ক ও সমালোচনামূলক মনোভাব জাগ্রত করে, স্থিতাবস্থার প্রতিষ্ঠান এবং রীতিনীতিকে প্রশ্ন ও পরীক্ষা করতে উৎসাহিত করে, সমাজের গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন বিকাশের জন্য কাজ করতে এবং নিজেদের সংগঠিত করতে ও রূপান্তর করতে সহায়তা করে।" তবে শুরুরও তো শুরু থাকে। সাজ্জাদ জাহির সম্পাদিত "অঙ্গার" (জ্বলন্ত কয়লা) নামে একটি চটি গল্প সংকলন ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল উর্দূ ভাষায়। লেখক ছিলেন সাজ্জাদ জহির, আহমেদ আলী, মাহমুদ-উজ-জাফার এবং রশিদ জাহান। ইসলাম ধর্মের উগ্র রক্ষণশীল মহলের কুসংস্কার ও ভন্ডামি এবং ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের অত্যাচারকে

তীব্র কশাঘাত ও সাহসী আক্রমণের আহ্বানে দৃপ্ত ছিল প্রতিটি গল্প। ভার্জিনিয়া উলফ এবং জেমস জয়সের মতো ব্রিটিশ আধুনিকতাবাদীদের পাশাপাশি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই তরুণ লেখকরা উর্দু সাহিত্যে মৌলবাদের বিরুদ্ধে সমাজচেতনার বিকাশ ঘটাতে আগ্রহী ছিলেন। ১৯৩৩ সালে 'অঙ্গার' বইয়ের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হতেই, গোঁড়া মৌলবিরা বইটি পুড়িয়ে দেয়। তারপরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বইটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তা সত্ত্বেও, "অঙ্গার" উর্দু লেখকদের একটি নতুন প্রজন্মকে উৎসাহ দিয়েছিল এবং আগামী দিনে প্রগতিশীল লেখক সমিতি গঠনের বীজ বপন করেছিল।

প্রগতিশীল লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা, লন্ডনে সমিতি গঠনের সুবিধাগুলি উপলব্ধি করার পাশাপাশি, এই অনুভবেও ঋদ্ধ ছিলেন যে লন্ডনে বসবাস করে ভারতীয় সাহিত্যের উপর প্রভাব ফেলা এবং সমাজবদ্ধ ভাল সাহিত্য তৈরি করা যাবে না। সাহিত্যে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব অতিক্রম করাও ছিল অন্যতম দায়বদ্ধতা। প্রগতিশীল লেখকদের আন্দোলন কেবল তখনই ফল লাভ করতে পারে যখন এটি ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হবে এবং যখন ভারতের লেখকরা এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করবেন। অবশ্যই লন্ডন অ্যাসোসিয়েশন সর্বোত্তম যেটা করতে পেরেছিল তা হল বিদেশের প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলা, পাশ্চাত্য বিদ্দজ্জন মহলে ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করা এবং ইউরোপের লেখকদের চিন্তাভাবনায় প্রভাবিত সামাজিক সমস্যাগুলি ভারতের প্রেক্ষিত ও দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যা করা। তাঁর স্মৃতিচারণায় সাজ্জাদ জাহির দাবি করেছেন, লন্ডনে এই গ্রুপের আনুষ্ঠানিক সংগঠনকে উৎসাহিত করতে বামপন্থী লেখক রালফ ফক্স বিশেষভাবে প্রভাবশালী ছিলেন। সংস্কৃতি ও সমাজের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার দাবীতে ১৯৩৫ সালের ২১শে জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত "ডিফেন্স অফ কালচার"'এর আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ডঃ মুলকরাজ ও সাজ্জাদ জাহিরের অংশগ্রহণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই কংগ্রেসের অব্যবহিত পরে, ১৯৩৬ সালের ২১-২৩ জুন লন্ডনে আয়োজিত আন্তর্জাতিক লেখক সংঘের (ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব রাইটার্স কনফারেন্স) অধিবেশনেও মুলকরাজ বক্তব্য উপস্থাপন করতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নিষিদ্ধ করা রচনাগুলির প্রকাশনার ব্যবস্থা এবং সেইসাথে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংস্কৃতির মসিকে ব্যবহার করে জনসংযোগ ও চেতনা গড়ে তোলা এবং একটি বিশ্বব্যাপী বুদ্ধিজীবী সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করা। আনন্দ ও জাহির এই কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয়গুলি আত্মস্থ করেছিলেন লেখক সংঘকে ভারতের মাটিতে প্রসারিত করার তাগিদেই। ১৯৩৩ সালে তাঁরা প্যারিস হয়ে লন্ডন ছেড়ে ভারতে ফিরে এলেন।

এবারে আমাদের আলোচনার অভিমুখ বৃটিশের উপনিবেশ ভারতবর্ষের দিকে সরে আসবে।

৩০শের দশক থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। দেশের নানা অন্চলে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র-যুবক- মহিলাদের গণআন্দোলন বৃটিশ শাসকের বুকে কাঁপন ধরয় এবং আরো অত্যাচার ও হিংস্রতার বুলডোজার নামায়। সেই ক্রান্তিকালে ভারতের লেখকশিল্পীরাও স্বাধীনতা সংগ্রামে আপামর জনগণকে সামিল করতে অগ্রগামী হয়ে মাঠে ময়দানে নেমে এসেছিলেন তাঁদের সৃজনের শাণিত সম্ভার নিয়ে। তাঁদের স্মরণে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী উচ্চারণ, 'আমাদের হাতে মেশিনগান নেই,আছে কলম।তাকে আমরা জীবনের মহত্তম কাজে প্রয়োগ করব।' ১৯৩৫ সালের ২৬ শে জুলাই কলকাতায় একটি প্রতিবাদ সভায় আবিসিনিয়াকে ইতালীর ফ্যাসিষ্ট আগ্রাসনের নিন্দা করা হয় এবং ১লা আগষ্ট "যুদ্ধ-বিরোধী দিবস" পালিত হয় গণমিছিলে। স্পেনে ফ্যাসিষ্ট হানা ও গৃহযুদ্ধের প্রতিবাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লেখেন রঁমা রঁলাকে। সমগ্র বিশ্ববাসীকে আবদন জানান মানবতা ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে ও স্পেনের আক্রান্ত মানুষের পাশে থাকতে। লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত লেখক সংঘকে ভারতের মাটিতে সক্রিয় করার জন্য পাশে এলেন ডঃ জোসি প্রসাদ, প্রমোদ রন্জন সেনগুপ্ত, ডঃ এম ডি তাসির,
কৃষাণ চান্দের , ইসমত চুগতাই , সাদাত হাসান মান্টো , আহমদ নাদিম কাসমি , আলী সর দার জাফরি , শিবতে
হাসান , এহতেশাম হোসেন , মমতাজ হোসেন , সাহির লুধিয়ানভি , কাইফি আজমি , আলী আব্বাস হুসাইনী , মাখদুম মহিউদ্দিন , ফারিখ বুখারী , খাতিড় গজনবী , রাজা হামদা নি , এম ইব্রাহিম জয়ো , শোভো
গিয়ানচান্দানি, শেখ আয়াজ , রাজিন্দর সিং বেদি , অমৃত প্রীতম , আলী সিকন্দর , জোয়া আনসারী , মাজাজ লাখনাভি, সাদাত হাসান মান্টো প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গণপ্রতিরোধের লক্ষ্যে ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সচেতনতা তৈরি করতে সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে একটি শক্তিশালী সাহিত্য - আন্দোলন গড়তে সক্রিয় হলেন।নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে সংগঠন গড়তে উৎসাহ দিলেন
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , মৌলভী আবদুল হক , চিরাগ হাসান হাসরাত ,
আবদুল মাজেদ সালিক , মাওলানা হাসরাত মোহানী , জোশ মালিহাবাদি , অধ্যাপক আহমেদ আলী , ডাঃ আখতার হুসেন রায়পুরি , ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ ,
অধ্যাপক মজনুন গোরখপুরী , ডঃ রশিদ জাহান ,
মাহমুদ উজ জাফর, প্রফেসর মনজুর হুসেন এবং ডাঃ আবদুল আলেম প্রমুখ। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বারবুস ও রঁলার নেতৃত্বে "World Committee Against War","League Against Fascisim and War" এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে,(১৯১১) "Independene of Thought" ও "CLARTE" প্রভৃতি সংগঠনের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যুক্ত ছিলেন।

সকলের আলোচনার মধ্যে দিয়ে অল্প সময়েই ১৯৩৬ সালের ৯-১০ এপ্রিল লক্ষ্ণৌতে গঠিত হল 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' (অল ইন্ডিয়া প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশন)। প্রখ্যাত উর্দূ ও হিন্দী ভষার সহিত্যিক মুন্সী প্রেম চাঁদ সভাপতি ও সাজ্জাদ জাহির সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনিত হলেন সর্বসন্মতিতে। উর্দূভাষী সাহিত্যিকরা আরো আগেই সাজ্জাদ জাহিরের নেতৃত্বে গড়েছিলেন "আঞ্জুমান তারাক্কি পসন্দ মুসান্নিফিন",এই সংস্থাও সংঘের সহযোগী হল। সভাপতির ভাষণে প্রেম চাঁদ বলেন, "এখন পর্যন্ত আমরা উর্দূ, হিন্দি ও অন্য ভারতীয় ভাষার গঠন, ব্যকরণ এবং তার নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনায় সন্তুষ্ট ছিলাম; উর্দু ও হিন্দিতে বিদ্যমান সমালোচনামূলক সাহিত্যেও বিষয় বা কনটেন্ট চেয়ে বিষয়ী বা আঙ্গিকের প্রাবল্য অর্থাৎ ভাষার নির্মাণ ও কাঠামো নিয়ে কাজ বেশি চোখে পড়ে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় কাজ ছিল এবং আমাদের সাহিত্যের প্রবর্তকরা এই প্রাথমিক প্রয়োজনটি সরবরাহ করেছেন। তাঁদের কাজটি প্রশংসাপূর্ণভাবে সম্পাদন করেছেন। তবে ভাষা একটি দায়বদ্ধতর বাহক মাত্র, সমাধান নয়। একটি পর্যায়, যাত্রার শেষবিন্দু নয় । ভাষার উদ্দেশ্য আমাদের চিন্তাভাবনা এবং আবেগকে মথিত করে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া। আমাদের এখন পারিপার্শিকতকে বিশ্লেষণ করতে হবে, বাস্তবতার প্রকৃত স্বরুপ অনুধ্যান ও তাৎপর্য নিয়ে নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে এবং ভাষাটি যে সামজিক উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে তা পূরণ করার উপায় সন্ধান করতে হবে। এটিই এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য "। প্রেমচাঁদ আরো বলেন, "আমাদের সাহিত্যের রুচি ও অনুভব দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে। সাহিত্য যেন জীবনের বাস্তবতাকে আঁকড়ে ধরে এবং মেহনতী মানুষের জীবনসংগীত হয়ে ওঠে। হতাশ প্রেমের গাওনা বা কেবল আমাদের বিস্ময় বোধকে সন্তুষ্ট করার জন্য রচনা এখন অপ্রয়োজনীয়। আমাদের পরাধীন জীবনের সমস্যা এবং সামাজিক মূল্য রয়েছে এমন থিমগুলির সাথে নিজেকে সংযুক্ত করতে হবে। যে সাহিত্য আমাদের মধ্যে একটি সমালোচনাত্মক মনোভাব জাগ্রত করে না বা আমাদের আধ্যাত্মিক চাহিদাগুলি পূরণ করে না, যা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া, গতিশীল নয়, যা আমাদের সৌন্দর্যের বোধকে জাগ্রত করে না, যা আমাদের জীবনযাত্রার গুরুতর বাস্তবতার মুখোমুখি করে না এবং দৃঢ়চেতা ও সংকল্পবদ্ধ হতে অনুপ্রেরিত করে না, তার কোন প্রয়োজন নেই, কোন ব্যবহার নেই। এটিকে এমনকি সাহিত্যও বলা যায় না। "

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। ঘোষণাপত্রে লেখা হয়, "ভারতের বিভিন্ন ভাষাগত অঞ্চলের সাথে মিল রেখে লেখকদের সংগঠন প্রতিষ্ঠা, সাহিত্যিকদের সম্মেলন, সাহিত্য প্রকাশের মাধ্যমে এই বিভিন্ন সাস্কৃতিক সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন, কেন্দ্রীয় সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন এবং সেইসব সাহিত্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা, যাদের উদ্দেশ্য সমিতির মূল লক্ষ্যগুলির সাথে সংঘাতময় নয। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে সমিতির শাখা গঠন, প্রগতিশীল ভাবাদর্শের সাহিত্য

রচনা এবং অনুবাদ, সাংস্কৃতিক পরিবৃত্তে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং এইভাবে ভারতের স্বাধীনতা এবং সামাজিক পুনর্জন্মের কারণকে আরও এগিয়ে নিতে, প্রগতিশীল লেখকদের স্বার্থ রক্ষা করতে, চিন্তা ও মতামতের মুক্ত অবাধ প্রকাশের অধিকারের জন্য লড়াই করা। ---- আমাদের সমাজ যে নবরূপ ধারণ করেছে তাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতিকামী মননধারাকে বেগবান করা আমাদের লেখকদের কর্তব্য। তাঁদর উচিত সাহিত্য-বিচার ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করা যা পারিবারক, যৌন, ধর্ম, চিন্তাগত, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি বিষয়কে সমস্ত সাহিত্য-প্রসঙ্গ থেকে নির্মুল করা। প্রগতি-বিমুখ ও পশ্চাতগামী মনোবৃত্বিকে উন্মুলিত করা এবং সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ, যৌন স্বৈরাচার ও সামাজিক অবিচারের যে ছায়া সাহিত্যে পড়েছে তার অপসারণের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা।"

লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের অল্পকাল পরেই প্রথমে কলকাতায় এবং তারপর এলাহাবাদ,লক্ষ্ণৌ,আলিগড়, দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই,পুণা,দেরাদুন,ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের শাখা কমিটি গঠিত হয়। প্রগতি লেখক সংঘের সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃজনের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য এবং সামাজিক সাম্যের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান রেখে সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে অন্নিষ্ঠ ছিলেন। সংঘ এই প্রত্যয়ে ঋদ্ধ ছিল যে. সৃজনকর্মের সাথে যুক্ত শিল্পী-সাহিত্যিক-কলাকুশলিরাও দেশের অধিকাংশ মানুষের সুখ-দুঃখ,আনন্দ-বেদনার অংশীদার। এটিও উল্লেখ করতে হবে, প্রথম থেকেই লেখক সংঘ জাতীয়তা ও আন্তর্জতিকতাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে ফ্যাসিবাদের ভয়ন্কর হিংস্রতা, পররাজ্য গ্রাস ও অমানবিক মতাদর্শ সম্পর্কে সচেতনতার পথে অগ্রসর হয়েছিল। প্রগতি লেখক সংঘের ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রসঙ্গে আমরা স্মরণে রাখব তার জাতীয় দায়বদ্ধতার সাথে ও আন্তর্জাতিকতার আদর্শের মেলবন্ধন। শুরু থেকেই প্যারিস-সম্মেলন থেকে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংস্থার সাথে সংযুক্ত ছিল। অবশ্য যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী লিগ ছিল আরো বড় ও ব্যাপক ভিত্তিক মিলন-মন্চ। তার সদস্যদের মধ্যে লেখক শিল্পী ছাড়াও ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ সভা ও অন্য পেশার ব্যক্তিরা ছিলেন কিন্তু লেখক সঘে সেই সুযোগ ও অবকাশ ছিল না। তাই দেখি, ১৯৩৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর প্রগতি লেখক সংঘের বঙ্গশাখা আন্তর্জাতিক বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করল। স্বাক্ষর করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মুন্সী প্রেমচাঁদ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চ্যাটার্জী, নন্দলাল বসু প্রমুখ। ভারতে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে এবং বিশ্বশান্তি আন্দোলনে লেখক সংঘ অবিস্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। একই সাথে সামাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এবং শ্রমিক-কৃষক গণআন্দোলনেও গৌরবোজ্জ্বল দায়িত্ব পালন করে।

প্রারম্ভিককালে ভারতীয় সাহিত্য অনুশীলন করলে দেখা যায়, অধিকাংশ সাহিত্যে ভারতীয় সমাজজীবন সম্পর্কে বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণ এবং রাজণ্য পৃষ্ঠপোষকতা - প্রাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিকতা ও বিনোদনমূলক বিষয় দ্বারা সৃজিত হয়েছিল। কিন্তু কিছু স্বাধীনচেতা লেখক সমসাময়িক সমাজ ও মানুষের অধিকারহীন নির্যাতনগুলি নিয়ে কাজ করেছিলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁরা প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে প্রগতি লেখক সংঘের সাথে যুক্ত হতে থাকেন। বিপ্লবী চিন্তাভাবনা এবং সমাজতান্ত্রিক চর্চায় বিশ্বাসের জন্য পরিচিত এই সংগঠন ভারতের তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি বিশেষত তার প্রথম সাধারণ সম্পাদক পিসি যোশীর কাছ থেকে প্রভূত সমর্থন পেয়েছিল।

১৯৩৮ডিসেম্বরে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের ২য় সম্মেলন হয়।
প্রগতি লেখক সংঘের অপর বৈশিষ্ট্য হল, শুরু থকেই বিভিন্ন প্রদেশ ও আন্চলিক ভাষা–সংস্কৃতির প্রসার, সৃজনশীল সাহিত্য প্রকাশনা ও অনুবাদের উদ্যোগ।গুণগত উৎকর্ষের লেখাগুলোর ইংরাজী তর্জমা 'The New Indian Literature' এবং 'New Writings' শীর্ষক ষান্মাসিক সংকলনগ্রন্থে প্রকাশিত হোত।
কিছুকাল পর থেকেই লেখক সংঘের ভিতরে মতাদর্শগত বিরোধ স্পষ্ট হতে থাকে। একটি গোষ্ঠী কমিউনিজমের মতাদর্শের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য এবং কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মসূচীর সঙ্গে লেখক সংগঠনের সংযোগ শক্তিশালী করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে থাকেন। অন্য পক্ষ এই পন্থার বিরোধীতা করে শিল্পীর স্বাধীন সৃজনের অধিকারের ভাষ্য নিয়ে মুখর হয়ে ওঠেন। এই দুই বিরুদ্ধ ধারা নবীন এই সংঘকে কিছুকালের মধ্যেই দীর্ণ করে তুলেছিল। দ্বিতীয় শিবিরের লোকেরা, যেমন আহমেদ আলি , সাহিত্যকে প্রচারমুখী ও দলীয় বৃত্তে রাখার বিরোধী ছিলেন এবং সাহিত্যের অভিঘাত হ্রাস হওয়ার ঝুঁকির কথাও বলেছিলেন। অন্য পক্ষ চেয়েছেন সাংস্কৃতিক কর্মসূচী হোক রাজনীতির পরিপূরক এবং গণসংগ্রামের সন্জীবনী বাহক।সাজ্জাদ জাহির তাঁর বিখ্যাত বই ' রোশনি ' তে উল্লেখিত বিতর্কের বিবরণ বিধৃত করেছেন । এছাড়াও, ক্রমশঃ সাংগঠনিক দূর্বলতাগুলি প্রকট হতে থাকে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের ঝোঁক ফণা তোলে। তা সত্বেও রজ্যে রাজ্যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় আন্চলিক লেখকদের সংগঠিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিত্তি করে, প্রগতি লেখক সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।
২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯–৪৫) উপরোক্ত মতাদর্শগত বিরোধ আরো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। ভারতে জাপানের আক্রমনের সম্ভাবনা ও ভয়ন্কর বিপদ দেখা দিল। ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক সরকার ও জনগণের মরণপন যুদ্ধ এবং ঐ বিপন্ন সময়ে মিত্রশক্তির অন্যতম শরিক হওয়া সত্বেও ব্রিটেন ও আমেরিকার নিষ্ক্রিয়তাকে বিচার ও রাজনৈতিকভাবে বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া লেখক সংঘের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করল। অবশেষে বামপন্থী লেখক শিল্পী ও মার্কসবাদী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা প্রতিষ্ঠা করলেন "সোভিয়েত

সুহৃদ সংঘ” এবং “যুব সংস্কৃতি পরিষদ” নামক সংস্থা। বাংলায় শুরু হল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ভাবাদর্শে অবিচল সাহিত্য সৃজনের নতুন যুগ।শোষনহীন সাম্যবাদী জনগণতান্ত্রিক দেশ গঠনের স্বপ্ন সংস্কৃতির উপজীব্য হয়ে দেখা দিল। ফ্যাসিবাদের দালালরাও চুপ করে বসে থাকার পাত্র হবে কেন, তাঁদর তাবেদার সাহিত্যিক গোষ্ঠী বামপন্থী সংস্কৃতিকর্মীদের সমালোচনা, দেশদ্রোহীতার অভিযোগ ও কুৎসার বন্যা ডেকে আনল।অসামান্য প্রতিভাবান তরুণ মার্কসবাদী রাজনৈতিক কর্মী ও লেখক সোমেন চন্দ ৮ ডিসেম্বর,১৯৪২ ঢাকার রাজপথে প্রকাশ্যে খুন হলেন।দলমত নির্বিশষে সকল মানবিক লেখক ও শিল্পীরা এই নারকীয় হত্যার ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। অনতিবিলম্বে ২৮ মার্চ,১৯৪২ তারিখে প্রগতি লেখক সংঘের,বাংলার শাখার নাম পরিবর্তন করে প্রতিষ্ঠিত হল “ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ।‘ অবশ্য সারা ভারত কমিটির নামটি ছিল অপরিবর্তিত। সাগ্রহে যুক্ত হলেন ‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকার সম্পাদক সজনীকান্ত দাস, সাহিত্যিক তারাশন্কর বন্দ্যোপধায়, বুদ্ধদেব বসু, বিনয় রায়, মোহিত ব্যানার্জী এবং সেই সময়ের আপামর সাহিত্যিক, কবি, অভিনেতা ও অভিনেত্, সংগীতশিল্পী, নাট্যশিল্পী, চিত্রশিল্পী, কলাকুশলী প্রমুখ।পরবর্তীকালে এঁরা অনেকেই উগ্র কমিউনিষ্ট বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন বটে, কিন্তু ঐ সময় এঁদের সদর্থক ভূমিকা ছিল।এই সংঘ প্রকাশ করে “ফ্যাসিবাদ ও নারী”, “বাইশে জুন”, “ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ”, “জনযুদ্ধের গান” ইত্যাদি বহু সৃজন পত্রপতিকা ও গ্রন্থ।

১৯৪১ সালে অনিল দে সিলভা দ্বারা বেঙ্গালুরুতে ‘পিপলস থিয়েটার’ স্থাপন একটি স্মরণীয় ঘটনা।। এর প্রাথমিক সদস্যরা ছিলেন বিভিন্ন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক দল, নাট্যদল এবং অন্যান্য প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরা। ‘পিপলস থিয়েটার’ নামটি প্রস্তাব করেছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, যিনি পিপলস থিয়েটারের ধারণাগুলি নিয়ে রঁমা রঁলার বই থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ।

চীন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশে দেশে ও ভারতে জাপানী ফ্যসিবাদের বর্বর আগ্রাসী যুদ্ধের মধ্যেই বাংলায় দেখা দিল ১৯৪৩ সলের মন্বন্তর। নারী, পুরুষ ও শিশু মিলে ৩৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হল বৃটিশের মদতপুষ্ট ধনী মুৎসুদ্দি ও কালোবাজারীদের সৃষ্ট কৃত্তিম দূর্ভিক্ষে। এই বীভৎস ঘটনার আঘাতে সর্বস্তরের লেখক শিল্পীদের ধৈর্য ও স্থৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে সার্বভৌমত্ব, স্বনির্ভরতা, সাম্য ও গণতন্ত্র সংযুক্তির জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির মতাদর্শগত আহবান থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারলেন না মানবিকতা ও শুভমূল্যবোধে প্রত্যয়ী কোন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। নতুন আশা, প্রেরণা এবং ভবিষ্যৎকে দেশের সমাজজীবনে গ্রথিত করার জন্য সাংস্কৃতিক শিবিরেও ধেয়ে এল জীবনবোধে দৃপ্ত জনসংস্কৃতি, সৃষ্টি ও সংগ্রামের খোলা হাওয়া। মাঠে ময়দানে, কলকারখানায় মানুষের ঘরে দুয়ারে পৌছলেন সলিল চৌধুরী, নিবারণ পন্ডিত,হেমাঙ্গ বিশ্বাস,নির্মলেন্দু চৌধুরী, পানু পাল

এবং আরো অনেক মহতী সুরকার-গীতিকার ও সংগীতশিল্পী লোকসংগীতের সম্ভার নিয়ে। গম্ভীরা পালাগান নিয়ে মালদহের লোকশিল্পীরা, কবিগানের ডালা নিয়ে হরিপদ কুশারি, নেপাল সরকার, রমেশ শিল, শেখ গোমানি প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের গান মেহনতী জনতার সখ্যে গেঁথে দিলেন দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ভামিক জৌনপুরী,প্রেম ধায়ান,দশরথ লাল, রেভা রায় গাইলেন জনজোয়ারের গান। বিনয় রায় মন্চস্থ করলেন "ম্যায় ভূখা হুঁ" পথনাটক। বিজন ভট্টাচার্য রচিত ও শম্ভূ ভট্টচার্য অভিনীত 'নবান্ন' ও 'জবানবন্দী' মন্চনাটক দেখে মানুষ প্রবলভাবে আলোড়িত হলেন বামপন্থী মতবাদের আঁচে। কবিতা ও সাহিত্যে দেখা দিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, মাণিক বন্দ্যোপাধায় এবং আরো অনেকে। এই স্কোয়াড দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'আগ্রা সাংস্কৃতিক স্কোয়াড' সহ আরও বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক দল গঠন দেশের বিভিন্ন প্রদেশে গঠন করা হয়েছিল। 'ভারত ছাড়ো' (১৯৪২) আন্দোলনের সময়ে প্রথম সারির জাতীয় নেতৃত্ব জেলে অন্তরীন থাকার সময় বাংলার মন্বন্তরে ত্রাণ, জাপানী ফ্যাসিবাদর বিরুদ্ধে গণসংঘটন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল দায়িত্ব কমিউনিষ্ট পার্টিই বহন করেছিল। সংস্কৃতি-আন্দোলনের এই প্রবাহে "ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' রুপান্তরিত হয়ে ২৫মে ১৯৪৩ গঠিত হল 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ', **ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির** সাংস্কৃতিক শাখা হিসেবে। দেশপ্রেম, স্বাধীনতা, জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিকতা,সাম্য ও গণতন্ত্র এবং গণসংস্কৃতির সৃজনে দক্ষ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের এই যৌথমন্চ 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' (ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন, আইপিটিএ) গড়ে উঠল সময়ের দাবীতে,বাম আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও রজনৈতিক জাগরণের আদর্শে। ১৯৪৩ সালে **মুম্বাইয়ে** একটি 'অল ইন্ডিয়া পিপলস থিয়েটার কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে এই গ্রুপটি নাটকের মাধ্যমে তৎকালীন সঙ্কটের প্রতিনিধিত্ব করার এবং তাদের অধিকার ও কর্তব্য বোঝার জন্য জনগণের সহায়তা করার ধারণা- উদ্দেশ্য উপস্থাপন করেছিল। এই সম্মেলনটি ভারতজুড়ে আইপিটিএর কমিটি গঠনের নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু এই নিবন্ধে আমরা গণনাট্য সংঘ প্রসঙ্গে আলোচনা করব না। এই সংকলনে তা অন্যত্র আলোচিত।

ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাসে দেখা যায়, যাঁরা একদিন ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে প্রগতির পথে যাত্রা করেছিলেন, রেখায়-রঙে-সহিত্যে- নাটকে-সংগীতে সৃজন করেছিলেন আধুনিক নব-চেতনার প্রতিমা, তাঁদের অনেকেই শাসক শ্রেণীর প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পন করলেন, উত্তরাধিকার বিসর্জন দিতে কুন্ঠা করলেন না।১৯৪৬ সালে স্বাধীনতার দোরগোড়ায় এঁদের কয়কজনের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল 'কংগ্রেস সাহিত্য সভা',যদিও তা বেশিদিন টেকে নি। কিন্তু নয়া দেশীয় শোষণশক্তির কাছে বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিসত্বার নির্লজ্জ বিক্রি সংঘবদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মর্মবাণীকে

আঘাত করল। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের সময় এই অংশের দালাল সাহিত্যিকদের লজ্জাতুর চরিত্র আরো প্রকট হয়ে উঠল।সংস্কৃতি আন্দোলনে প্রবল সংকটর ঝড় যেন আছড়ে পড়ল। তবুও ইতিহাস সাক্ষী, উত্তরাধিকার ও উত্তরাধিকারী শক্তি সময়ের দাবীতেই টিকে থাকে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভারতীয় গণনাট্য সংঘকে এই রাজ্যের বুকে যে সাহসী তরুণ কর্মীরা ১৯৬৪ সালে নতুন করে গড়ে তুললেন, তাঁরা চিরকাল মেহনতী মানুষের ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে রইলেন।এরপরে ১৯৭০ দশকের শুরু থেকে সারা দেশে, বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে, নির্মম সন্ত্রাসের শ্বাসরোধকারী পরিবেশ নেমে আসে।গণতন্ত্রের নামে প্রহসন, জীবন জীবিকার নিরাপত্তা ধ্বংস,বিশ্বাস ও মত প্রকাশের অধিকারহীনতার সমাজ যেন বৃটিশ শাসনের দুঃস্বপ্নকে ফিরিয়ে দিল। পত্র পত্রিকা, সংস্কৃতি জগতের বিভিন্ন পেশার মানুষ, প্রতিষ্ঠান, নাটক, চলচ্চিত্র সর্বত্র চলেছে পরিকল্পিত আক্রমণ। এই আবহে গণতন্ত্র, নাগরিক অধিকার, বাকস্বাধীনতা ও সামাজিক শৃঙখলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, প্রতিবাদের প্রতিস্পর্ধী মিছিলে, অনিবার্যভাবে জন্ম নিল ‘গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সন্মীলনী’ ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ তারিখে। নব পর্যায়ে সেই সংগঠন আজ ‘গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ’ নামে উত্তরিত।রাজ্যের সর্বত্র লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি কর্মীদর আজকের এই যৌথ মন্চ গত শতকের নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘেরই সার্থক উত্তরসুরী।

তথ্যসূত্র :

১)সুধী প্রধান সম্পাদিত, ‘*ভারতে মার্কসবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন’* , ১ম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি,কলকাতা,১৯৭৯

২) সুধী প্রধান সম্পাদিত, ‘*ভারতে মার্কসবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন’* , ১ম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি,কলকাতা,১৯৭৯ গ্রন্থে ডঃ মুলক রাজ আনন্দ রচিত, 'প্রগতিশীল লেখক আন্দোলন’।

৩) নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতকিতা ও রবীন্দ্রনাথ, ষষ্ঠ খন্ড।

৩) কার্লো কোপপোলা সম্পাদিত, ‘*মার্কসবাদী প্রভাব এবং দক্ষিণ এশীয় সাহিত্য* ‘, ১ম খণ্ড, এশিয়ান স্টাডিজ সেন্টার , মিশিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব ল্যানসিং, মিশিগান,১৯৭৪ গ্রন্থে কার্লো কোপপোলা রচিত, ' দ্য অল ইন্ডিয়া প্রগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন: দ্য ইউরোপীয় ফেজ।

৪) প্রিয়মবদা গোপাল , *লিটারারি র‍্যাডিক্যালিজম ইন ইন্ডিয়া, জেন্ডার, নেশন অ্যান্ড ট্রানজিশন টু ইন্ডিপেন্ডেন্স,*(লন্ডন এবং নিউ ইয়র্ক, রাউটলেজ , ২০০৫।

৫) সাজ্জাদ জাহির, *দি লাইট : দি হিস্ট্রি অফ দি মুভমেন্ট ফর প্রগ্রেসিভ লিটারেচার ইন দি ইন্দো-পকিস্থান সাবকন্টিনেন্ট,* অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২০০৬।

৬) সরোজমোহন মিত্র, *প্রগ্রেসিভ কালচারাল মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল,সোস্যাল সাইনটিস্ট, ৮ (৫/৬),১৯৭৯-৮০।*